‘দুর্নীতির জন্ম হয় নীতির পেটে’

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

বাংলাদেশের সব চাইতে সোজা কাজ

দুর্নীতি দমন কমিশন অবশেষে গঠিত হবার সংবাদে দেশের সকল মানুষের মত আমিও সাংঘাতিক খুশি হয়েছি। যখন কমিশনের চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করা হলো আমার মন প্রচণ্ড ঈর্ষায় ভরে গেলো। ইস, বাংলাদেশের সবচাইতে সোজা কাজের দায়িত্বটা বিচারপতি সুলতান হোসেন খান পেয়ে গেলেন! কী ভাগ্যবান তিনি। মনে মনে এমনও ভাবলাম : আহা একাজটা যদি আমি পেতাম, কী মজাটাই না হতো। এমন এক দায়িত্ব, যেখানে গাছে না-চড়তেই কাঁদি কাঁদি ফল পাওয়া খুবই সোজা। এটা যে একেবারে সহজ কাজ এ ব্যাপারে আশা করি দেশের সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন।

সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র থাকাবস্থায় বাংলা বাগধারা শেখানোর সময় প্রথম ‘গোঁফ-খেজুরে’ শব্দটার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। বাংলার শিক্ষক রসিয়ে গল্প করে শব্দটির উৎপত্তির কথা বুঝিয়ে ছিলেন। এই গল্প আর শব্দটি আর কখনো ভুলিনি। অলসের শিরোমনিকে নিয়ে এ গল্প। তিনি এমন অলস, খেজুর খাওয়ার শখ হলেও খেজুর ভর্তি গাছে উঠে খেজুর খেতে অনিচ্ছুক। কষ্ট করে পায়ে হেঁটে খেজুরতলায় যেতেও নারাজ। তাঁকে নিয়ে গিয়ে খেজুর গাছের তলায় শুইয়ে দেয়া হলো। তিনি খেজুর গাছের তলায় খেজুরের দিকে তাক করে বিরাট হা করে শুয়ে রইলেন। পাকা খেজুর যদি দু’চারটা মুখের ভেতর এসে পড়ে, তবে খাবে। অবশেষে খেজুর পড়লো, তবে মুখের ভিতর নয় গোঁফের কাছে। গোঁফেই আটকে রইলো। কিন্তু লোকটি এমন অলস যে, গোঁফ থেকে টেনে এনে মুখে ঢোকানোর প্রচেষ্টাও নেই তার মধ্যে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের কথা উঠতেই আমার গোঁফ-খেজুরের গল্পটা মনে পড়লো অন্য কারণে। দেশে এমন দুর্নীতি এই কমিশন যদি শুধু হা করে শুয়ে থাকে তবে নির্ঘাত দুর্নীতির অপরাধীরা টুশটুশ করে রসগোল্লার মত অনবরত সোজা মুখের মধ্যে ঢুকতে থাকবে। কমিশনের শুধু হা করাটাই চাই।

সারা বিশ্বে দুর্নীতির শীর্ষ দেশ আমরা। নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে দুর্নীতি ধেয়ে আসে চারদিক থেকে। তাদেরকে খুঁজবো কী ! তারা সারাক্ষণ আমাদের খোঁজ রাখছে। তারা ঘিরে আছে আমাদেরকে সারাক্ষণ। এমন দেশে কোন উদ্যোগ আয়োজন করে দুর্নীতি ধরার প্রয়োজন আছে মনে করলে লোকে আমাদের নির্ঘাত পাগল ভাববে। দুর্নীতির এই বানের পানিতে খালি হাতেই মাছ ধরা যায়, ঘরে বসেই। পলো লাগে না। জাল লাগে না। কোচ লাগে না।

এমন এক কাজের দায়িত্ব কেউ পেয়ে গেলে ঈর্ষা হবে না তো কি হবে?

ঈর্ষা করার আরো একটা কারণ আছে। এটা এমন কাজের দায়িত্ব যেখানে সফল হওয়া যেমন একেবারে সহজ, তেমনি এখানে সামান্য সফলতার জন্য দেশ জুড়ে সকল মানুষের বাহবা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া একেবারে শতকরা একশ’ শতাংশ নিশ্চিত। মাঝারি সাফল্যের জন্য সকল মানুষের স্মরণীয় ব্যক্তিতে পরিণত হওয়া যায়।

বড় সাফল্যে কী পরিমাণ যে দেশের মানুষের কৃতজ্ঞতা পাওয়া যাবে সেটা ভাবতেই সীমাহীন সম্ভাবনার কথা মনে করে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। যিনি এই সহজ কাজটা করে দেবেন তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে স্থায়ী আসন পেয়ে যাবেন।

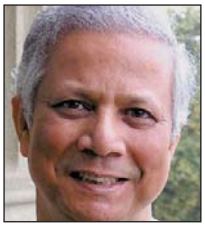

‘আমি শুরুতেই ধরে নিতাম আমার লোকবলের অভাব নেই। সারা দেশের মানুষ আমার লোকবল। আমি ধরে নিতাম আমার ক্ষমতার অভাব নাই... যেহেতু আমার কোনো আদালতি ক্ষমতার দরকার নাই’

আমি সোজা দমন কাজেই নেমে যেতাম

চোখ বন্ধ করে ভাবছিলাম, আমি যদি কমিশনের চেয়ারম্যান হয়ে যেতাম তাহলে কী করতাম? প্রথম কথাটা মনে আসলো, আমি সোজা দমন কাজেই নেমে যেতাম। কমিশনের নাম যখন দুর্নীতি 'দমন' কমিশন, আমি আর অপেক্ষা করবো কীসের জন্য। দমনই করতাম। এটা দুর্নীতি বিচার কমিশন নয়, এটা দুর্নীতির পোস্ট-মর্টেম কমিশন নয়, এটা দুর্নীতি বিশ্লেষণ কমিশন নয়, এটা দুর্নীতির দলিলের আর্কাইভ নয়, এটা দুর্নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান নয়। এটা দুর্নীতি দমন কমিশন। প্রতিদিন অফিস থেকে ঘরে ফিরে নিজেকে জিজ্ঞেস করতাম : আজকে কতটুকু দমন করলাম? আমি বিচারও করবো, গবেষণাও করবো, সবই করবো। কিন্তু সব কিছুর লক্ষ্য থাকবে একটা। দমন। সেই দমনের ফলাফল স্পষ্টভাবে দেখা যেতে হবে। মানুষকে সেটা অনুভব করতে হবে। অন্য সব কাজের ভিড়ে কমিশনের আসল কাজটা যেন ভুলে না-যাই সে-বিষয়টা নিশ্চিত করতাম।

আমি শুরুতেই ধরে নিতাম আমার লোকবলের অভাব নেই। সারা দেশের মানুষ আমার লোকবল। আমি ধরে নিতাম আমার ক্ষমতার অভাব নাই... যেহেতু আমার কোনো আদালতি ক্ষমতার দরকার নাই। আমার যেকাজ, দুর্নীতি দমনের কাজ, সেকাজে আমার অফুরন্ত ক্ষমতা আছে। আমার নৈতিক ক্ষমতা এবং আমার কাজের পেছনে মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন থেকেই আসে আমার এই ক্ষমতা ।

সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বানাতাম 'বর্তমান' বিভাগকে

মনে মনে ভাবছিলাম, আমি শুরুতেই কমিশনকে তিনটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করতাম। ১. বর্তমান বিভাগ, ২. ভবিষ্যৎ বিভাগ এবং ৩. অতীত বিভাগ। আমি এই তিন বিভাগকে গুরুত্বের ক্রমানুসারে সাজাতাম এভাবে। সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হতো 'বর্তমান' বিভাগ। আমি এই বিভাগের জন্য কমিশনের মোট শক্তি, সামর্থ্য ও কর্মযজ্ঞের ৫০ শতাংশ নিয়োজিত করতাম এই বিভাগের পেছনে। এই বিভাগের কাজ হবে বর্তমানে যাতে দুর্নীতি ঘটতে না-পারে সেটা নিশ্চিত করা। বর্তমানে সংঘটিত মোট দুর্নীতিকে তাৎক্ষণিকভাবে শূন্যে নামিয়ে আনতে পারবো না তা ঠিক, কিন্তু জোর চেষ্টা চালাবো। প্রথম চোটেই দুর্নীতি কমিয়ে আনবো ব্যাপক পরিমাণ।

গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে রাখতাম ভবিষ্যৎ বিভাগকে। এতে কমিশনের মোট সময় ও অর্থের ৩০ শতাংশ ব্যয় করতাম। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিভাগ একত্র করলে কমিশনের ৮০ শতাংশ কাজ দাঁড়াতো। অগ্রাধিকারের তৃতীয় স্থানে থাকতো 'অতীত' বিভাগ। এতে অবশিষ্ট ২০ শতাংশ সময় ও অর্থ ব্যয় করতাম।

'বর্তমান' বিভাগের কাজকর্মটা আমি কীভাবে পরিচালিত করতাম সেটা এখানে কিছুটা বিস্তারিতভাবে বলবো। অন্য দু'বিভাগের কথা সংক্ষেপে শেষে উল্লেখ করবো।

'কমিশন বিভিন্ন অফিস ও অফিসপ্রধানদের নিয়েই কাজ করবে। অফিসকে প্রতিপক্ষ ভেবে কাজ করবে না। লক্ষ্য হলো দুর্নীতি দমন করা, কাউকে হেয় করা নয়। আমার ধারণা আমি বাংলাদেশের বহু অফিসের এবং অফিসপ্রধানের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা পাবো'

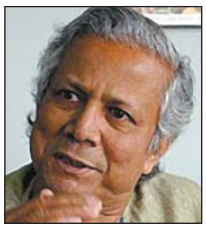

বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতাম কমিশনকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা

বর্তমান বিভাগের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হবে দুর্নীতি দমন কমিশনকে নিষ্কলুষ রাখা। এটাকে আমি আমার ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতাম। দুর্নীতি দমন কমিশনকে দুর্নীতিশূন্য রাখতেই হবে। এই কমিশন হবে জিরো টলারেন্স জোন। এখানে দুর্নীতির সামান্যতম ছায়াও সহ্য করা হবে না। তারপর সারাদেশে যে কয়েকটি জায়গা দুর্নীতির অভয়ারণ্য হিসেবে পরিচিত সেগুলি যাতে আর অভয়ারণ্য থাকতে না-পারে তার দিকে মনোযোগ দেবো। এসব জায়গায় এমন ভয় জাগিয়ে দেবো যে দুর্নীতি করতে হলে আগ-পাছ ভেবে করতে হবে। দেয়ালেরও চোখ-কান, ক্যামেরা, সেনসর আছে এমন ধারণা সকলের মনে বদ্ধমূল করতে হবে। বাংলাদেশের দুর্নীতি এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে এটা আর ফিসফাস, ইশারা ইঙ্গিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। এটা এখন প্রকাণ্ড একটা দুর্নীতির হাট। এই হাটের মধ্যে সবার সামনে দর কষাকষি ও লেনদেন করতে বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ করার কথা কারো মনে উদয় হয় না। সহকর্মীদের সামনে বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকা গুনে নেয় এমনভাবে যেন দোকানি গৌরবের সঙ্গে সওদার টাকা বুঝে নিচ্ছে। সব ক'টা অভয়ারণ্যে এক সঙ্গে হামলা করে সফল হতে কষ্ট হবে জেনে কৌশলগত কারণে কয়েকটি জায়গাকে চিহ্নিত করবো। এ কয়টা অভয়রাজ্যে ভয়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবো, এই হবে আমার অঙ্গীকার। যে ক'টা অভয়ারণ্যে হামলা করবো সেখানে সাফল্য নিশ্চিত করবো। আমার বাছাই করা জায়গাগুলির ঠিকানা সাংবাদিক ভাইদের কাছে আগেভাগে দিয়ে দেবো। তাদের বলবো আমাকে খবর জানাতে, আমার কাজে কোনো ফল হচ্ছে কিনা জানাতে। যারা আগে এসব জায়গায় ঘুষ দিতেন তাদের সাথে মতামত যাচাই করবো কিছুদিন অন্তর অন্তর। জানতে চাইবো অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে কিনা। দেশের সর্বত্র ভুক্তভোগীদের উৎসাহিত করবো 'ভুক্তভোগী সমিতি' বানাবার জন্য। তাঁরা সাক্ষী প্রমাণ আমাদের কাছে নিয়ে আসবেন। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সেটা সংশ্লিষ্ট অফিসের সঙ্গে যাচাই করে দেখবো তাদের কোনো বক্তব্য আছে কীনা। তারা অবশ্যই সব কিছু অস্বীকার করবেন। কিন্তু বুঝে যাবেন যে তাদের অবস্থা এখন আগের মত নিরুপদ্রব নয়। আমার বড় কাজ হবে উপদ্রব সৃষ্টি করা। ভালো রকমের উপদ্রব সৃষ্টি করা। দুর্নীতিবাজদের মনে আতঙ্ক জাগিয়ে দেয়া। সাময়িকভাবে নয়। স্থায়ীভাবে।

কীরকম জায়গা প্রথমে বাছাই করবো? চট্টগ্রাম বন্দর, আয়কর বিভাগ, বিমানবন্দর, যেখানে সব চাইতে বেশি বদলির তদবির হয় (যেমন : ডাক্তারদের বদলি, শিক্ষক বদলি, বি.ডি.আর. বদলি, পুলিশ বদলি, কাস্টমসের বদলি), যেখানে একটি বড় আন্তর্জাতিক কেনাকাটা হতে যাচ্ছে, যেখানে একটা ঠিকাদারি কনট্রাক্ট দেয়া হতে যাচ্ছে ইত্যাদি। একটা নির্দিষ্ট কেনাকাটার প্রক্রিয়া আমি আগেই ঘোষণা দিয়ে দিতাম এই বিশেষ কেনাকাটাতে যাতে দুর্নীতি হতে না-পারে সেজন্য দুর্নীতি দমন কমিশন পুরোপুরি দায়িত্ব নিয়েছে। এটা সকল পক্ষকে জানিয়ে রাখতাম। একটা বিশেষ ঠিকাদারির টেণ্ডার নোটিসকে কেন্দ্র করে শুরু করে কার্যাদেশ দেয়া পর্যন্ত সার্বক্ষণিকভাবে দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব কমিশন গ্রহণ করেছে এই ঘোষণা আমি আগেই করে দিতাম। যাতে সকল পক্ষ জানতে পারে আমরা এর মধ্যে আছি।

কমিশনের সব চাইতে বড় শক্তি দেশের মানুষ

দেশের সকল মানুষ আন্তরিকভাবে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রচণ্ড সমর্থক। আমি কাজের দিক থেকে তাদেরকে কমিশনের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ফেলতাম। কমিশনের আইন, দেশের আইন, থানা-পুলিশ, বিচার বিভাগ অবশ্যই কমিশনের কাজে বিরাট শক্তি যোগায়। কিন্তু সব চাইতে বেশি এবং কার্যকর শক্তির আধার হচ্ছে দেশের মানুষ। বিশেষ করে ভুক্তভোগী মানুষ। আমি ভুক্তভোগী মানুষকে সঙ্গে নিয়েই দুর্ভোগ থেকে জাতিকে রক্ষা করার উদ্যোগ নিতাম। ভুক্তভোগী সমিতির বাইরেও ভুক্তভোগীদের সঙ্গে বৈঠক করতাম, তাদের পরামর্শ নিয়মিত সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করতাম, ওয়েব-সাইটে তাদের মতামত সংগ্রহ ও সংবাদ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতাম। ব্যাপকভাবে মোবাইল ফোনে এবং অন্য ফোনে হটলাইন বসাতাম। হটলাইনের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে যেকোন ভুক্তভোগী কমিশনকে যেকোনো খবর বা পরামর্শ দেবার বা প্রতিকার চাওয়ার ব্যবস্থা রাখতাম। কমিশনের পক্ষ থেকে পরামর্শ দেবারও ব্যবস্থা রাখতাম।

আমি সাংবাদিকদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলতাম। তাঁদের উৎসাহিত করতাম হালে যেসব দুর্নীতি হচ্ছে সেগুলির উপর কড়া নজর রাখতে এবং অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রিপোর্ট প্রকাশ করতে। একই সঙ্গে ভুয়া দুর্নীতির অভিযোগ বানিয়ে যাতে কেউ অপসাংবাদিকতার চেষ্টা না-করে সে ব্যাপারে তাদেরকে সাবধান রাখতাম। এরকম অপসাংবাদিকতাকে যে দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি হিসেবে গণ্য করে এবং তাকে দমন করাও যে কমিশনের কাজ এটা পরিষ্কার তাদের বুঝিয়ে দিতাম। সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতাম।

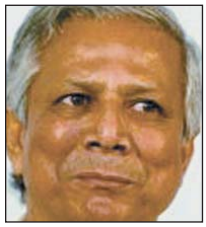

‘বছর বছর দুর্নীতি মাপতে না-শিখলে দুর্নীতি কমানো যাবে না। কার কত কমলো, কার কত বাড়লো এটা জানা গেলেই নিজেদের বোধোদয় হবে। বোধোদয় হলে অসাধ্য সাধন করা যায়’

সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের সময় ভারতের অতি প্রসিদ্ধ ‘তেহেলকা ডট কম’-এর কাহিনীটি সচিত্র সবিস্তারে তুলে ধরতাম। ২০০১ সালের মার্চ মাসে কী করে একজন সাংবাদিক সমরাস্ত্র ব্যবসায়ী সেজে ভারতের তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল বিজেপি-র সভাপতির হাতে ঘুষ দেবার ছবি ভিডিও করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছিল। যদিও আইনের মারপ্যাঁচে অপরাধীর শাস্তি হয়নি, বরং সাংবাদিককে নাজেহাল হতে হয়েছিল নানাভাবে, তবু এই ঘটনায় ভারতের পুরো রাজনীতি টালমাটাল হয়ে পড়েছিল। ঘুষ গ্রহণকারী বিজেপি সভাপতিকে তার সভাপতিত্ব হারাতে হয়েছিল। এখন ছবি তোলা আরো সহজ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে আরো সোজা হবে। সাংবাদিকদের প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণও দিয়ে দেবো।

সকল পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে কাজে নামবো

কমিশনের কাজে আমি সকল পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে কাজে নামবো। দেশের সাধারণ মানুষ, ভুক্তভোগীরা, যে অফিসে/প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি হচ্ছে তাদের কর্মকর্তা কর্মচারীরা, সে অফিস/প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা সবাইকে আমি কমিশনের কাজের সহায়কশক্তি হিসেবে ধরে আমি কাজে নামবো। যতক্ষণ কেউ কমিশনের কাজের বিপক্ষে একথা কমিশনের মনে না-হচ্ছে, ততক্ষণ সবাই কমিশনের সঙ্গে আছে এটাই ধরে নেবো। আমি প্রথমে প্রত্যেক অফিস-প্রধানের সঙ্গে আলাচনা করবো। তাঁকে বলবো তাঁর প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিসূচক তৈরি করে দিতে। তাঁকে অনুরোধ করবো তিনি তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে পর পর বছরগুলিতে এই দুর্নীতি কমিয়ে কোন বছর কোন পর্যায়ে নামিয়ে আনতে চান সেটা স্থির করে দিতে। কমিশন তাঁর কাজে সহায়তা দেবে, তিনিও যেন কমিশনের কাজে সহায়তা দেন। এ ব্যাপারে একটা সমঝোতা করে ফেলতাম। তাঁর কাজে তিনি সফল হতে পারছেন কীনা, কতটুকু সফল হচ্ছেন সেটা তিনি মনিটর করবেন, কমিশনও আগ্রহের সঙ্গে মনিটর করে ফলাফল তাঁকে জানাতে থাকবে। কমিশন খুব আনন্দিত হবে তিনি যদি কমিশনের কোনো পরামর্শ চান অথবা যৌথভাবে একটা কর্মসূচি গ্রহণ করতে চান। তাঁর অফিসকে দুর্নীতিমুক্ত করতে কমিশন নিজে কী কর্মসূচি নিচ্ছে সেটাও তাঁকে জানিয়ে দিতাম। তাঁর পরামর্শক্রমে রদবদল করতাম। তাঁর অফিস যেদিন নিজেকে দুর্নীতিমুক্ত ঘোষণা করবে কমিশন সেদিন সেখানে দুর্নীতিমুক্তির উৎসব পালন করার ব্যবস্থা করবে।

কমিশন বিভিন্ন অফিস ও অফিসপ্রধানদের নিয়েই কাজ করবে। অফিসকে প্রতিপক্ষ ভেবে কাজ করবে না। লক্ষ্য হলো দুর্নীতি দমন করা, কাউকে হেয় করা নয়। আমার ধারণা আমি বাংলাদেশের বহু অফিসের এবং অফিসপ্রধানের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা পাবো। এর ফলে দুর্নীতির পরিমাণে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে।

সর্বত্র ‘সহায়ক গোষ্ঠী’ সৃষ্টি করতাম

আমি বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকজন নিয়ে ছোট ছোট সহায়ক গোষ্ঠী সৃষ্টি করতাম। যাঁরা ভুক্তভোগী সমিতির অংশ হতে পারেননি তাঁদেরকে নিয়ে এই সহায়ক গোষ্ঠী করতাম। অধ্যাপক, ছাত্র, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, সাংবাদিক, চাকরিজীবী, শ্রমিক, আইনজ্ঞ, এনজিও, শিল্পীগোষ্ঠী- কেউ যেন দুর্নীতি দমনের কাজ থেকে বাদ পড়ে না-যায় সে ব্যবস্থা করতাম। নাট্যকার এবং টিভি, রেডিওকে উৎসাহিত করতাম দুর্নীতি দমনে সবাইকে এগিয়ে আনার জন্য দুর্নীতি দমন বিষয়ক টিভি সিরিয়াল তৈরি করার জন্য। এর বিষয়বস্তু হবে- আমরা সাধারণ মানুষ উদ্যোগ নিলে দুর্নীতি পালাবার পথ খুঁজে পাবে না; দুর্নীতি দমন কমিশন আমাদের সঙ্গে আছে।

রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করবো একই উদ্দেশ্য নিয়ে। সকল পর্যায়ের রাজনৈতিক দলের নেতাদের আহ্বান জানাবো দলের নেতা কর্মীদের মধ্য থেকে দুর্নীতি উৎপাটনের কর্মসূচি ও সময়সূচি গ্রহণ করতে, মনিটর করতে। তাঁদের কর্মসূচিতে কোনো দল কী রকম সাফল্য অর্জন করছে সেটা জনসাধারণকে এবং কমিশনকে নিয়মিতভাবে জানানোর জন্য অনুরোধ করতাম। তাঁদের কাজের সাফল্য-ব্যর্থতা যাচাই করে কমিশনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য এবং উৎসাহ যোগাতে থাকবো।

পার্লামেন্টারি দলগুলির সঙ্গেও বৈঠক করবো তাঁদের পরামর্শ নিতে। তাঁরা কীভাবে, কোন কোন পর্যায়ে দেশে দুর্নীতি দমনে ভূমিকা রাখতে পারে সেটা জেনে নেবার জন্য এবং সে অনুসারে কাজে ভূমিকা রাখতে সাহায্য করার জন্য।

বড় বড় পুরস্কার ঘোষণা করতাম

কমিশনের ‘বর্তমান’ বিভাগের কাজ হিসেবে আমি আরেকটা কাজ করতাম। বড় বড় পুরস্কার ঘোষণা করতাম। খবরের কাগজ উল্টালে সব চাইতে বড় এবং আকর্ষণীয় পুরস্কারের ঘোষণা পাবেন দুর্নীতি দমন কমিশনের। ‘সাক্ষী প্রমাণসহ ধরিয়ে দিলে আকর্ষণীয় পুরস্কার’- এভাবে ঘোষণা থাকতো। তার সঙ্গে থাকতো যারা ইতিমধ্যে পুরস্কার পেয়েছে ছবিসহ তাদের কৃতিত্ব বর্ণনা করে স্টোরি। পুরস্কারের সোজা বক্তব্য থাকতো এরকম- সাক্ষী প্রমাণ এবং টাকাসহ ধরিয়ে দিতে পারলে যত টাকার দুর্নীতি ধরিয়ে দেবেন তত টাকা সংবাদদাতা পাবেন। এতে কমিশনের এক টাকাও খরচ হতো না- অথচ বড় বড় সব দুর্নীতির খবর সাক্ষী প্রমাণসহ আমাদের কাছে চলে আসতো। কী কী সাক্ষী প্রমাণ আমরা চাই সেটা বিজ্ঞাপনেই বলা থাকতো। এতে দুর্নীতিবাজ ধরা পড়া ছাড়াও ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা দু’জনের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হতো। ঘুষগ্রহীতা মনে করতো ঘুষদাতা কি আমাকে ধরিয়ে দিয়ে আমার উপর তার রাগ মেটাবার চেষ্টা করছে? কারণ তার টাকা তো তার কাছেই থেকে যাচ্ছে। ঘুষগ্রহীতার সহকর্মীরা যারা তার বড় রকমের আয়ে ঈর্ষান্বিত তারা তাকে ধরিয়ে দিয়ে নিজে টাকাটা পাবার চেষ্টা করতো। সহকর্মীদের অনেকে একাজে নিজেদেরকে স্পেশালাইজডও করে ফেলতো। তারা শুধু ধরিয়ে দিয়েই ন্যায্যভাবে অনেক টাকা উপার্জন করার পথ বেছে নিতেন।

আমি বহু রকমের পুরস্কার ঘোষণা করতাম। কোনটা টাকার পুরস্কার। কোনটা সপরিবারে বিদেশ ভ্রমণের পুরস্কার। কোনটা গাড়ি পুরস্কার। কোনটা টিভি ফ্রিজ পুরস্কার। অথচ কমিশনের কোন টাকাই খরচ হবে না। পুরস্কারের স্পনসর হবেন ব্যবসায়ীরা। যাঁরা দুর্নীতির কবল থেকে মুক্ত হয়ে পুরস্কারের চাইতে অনেক বেশি লাভবান হবেন। পুরস্কারগুলোকে খুব সৃজনশীল হতে হবে। এজন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আমি বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞদের একত্র করে একটার পর একটা নতুন বিজ্ঞাপন সৃষ্টির দায়িত্ব দিতাম।

আরেকটা কাজে পুরস্কার দিতাম। এটা হতো প্রতিযোগিতার পুরস্কার। কীভাবে নিয়োগ বদলির সময় ঘুষ নেয়া বন্ধ করা যায় তার পরামর্শ দেবার প্রতিযোগিতা। কীভাবে আয়কর বিভাগ থেকে দুর্নীতি চিরতরে বন্ধ করা যায় তার জন্য প্রতিযোগিতা। টেণ্ডার দুর্নীতি বন্ধের পরামর্শ প্রতিযোগিতা। কেনাকাটিতে দুর্নীতি বন্ধের বুদ্ধির প্রতিযোগিতা।

সাধারণ ভুক্তভোগী নাগরিকরা ছাড়াও অতীতে যাঁরা দুর্নীতি করে জীবনে উন্নতি

করেছেন এবং যাঁরা দুর্নীতির কবলে পড়ে নাজেহাল হয়েছেন, আমার ধারণা তাঁদের অনেকে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার নিতেন এবং জাতির জীবনে একটা অবদানও রাখতেন।

বলা বাহুল্য, পুরস্কারের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন আমার কর্মকাণ্ডে একটা বিরাট অংশ জুড়ে থাকতো।

প্রতি বছর দুর্নীতির সূচক প্রকাশ করতাম

আমি আরেকটা কাজ করতাম।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল যেমন বিভিন্ন দেশের দুর্নীতির সূচক তৈরি করে সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দেয় দুর্নীতিতে কার অবস্থান কোথায় আমিও কমিশনের পক্ষ থেকে দুর্নীতির সূচক তৈরি করতাম। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়, সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য এই সূচক তৈরি করে প্রতি বছর দেশবাসীকে জানিয়ে দিতাম। এর মাধ্যমে দু'টি ফল পাবার চেষ্টা করতাম। একটা হতো প্রত্যেক মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কে কার উপরে বা নিচে সেটা বুঝানো। আরেকটা হতো আগের বছরের সঙ্গে তুলনা করে মন্ত্রণালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি বাড়ছে না কমছে, কত বাড়ছে, কত কমছে তার তথ্য পরিবেশন করা। সার্বিকভাবে বাংলাদেশের দুর্নীতি কমছে কি বাড়ছে তা-ও জানা যেতো। বলা বাহুল্য দুর্নীতি দমন কমিশনের জন্যও একই পদ্ধতিতে সূচক তৈরি করতাম। কমিশন নিজেকে দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারছে কিনা এটা এর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত যাচাই করা যেতো।

কখন পদত্যাগ করবো

আমার চেষ্টা থাকতো দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠার ফলে দুর্নীতিতে কোনো ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারলাম কিনা সেটা ক্রমাগতভাবে যাচাই করা। দু'টি ব্যাপারে আমি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখতাম। যদি আমার দায়িত্ব গ্রহণের দু'বছরের মধ্যে বাংলাদেশ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের তালিকায় ১ নং স্থান থেকে অন্য কোনো স্থানে সরে না-যায় তবে আমি সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করবো। দ্বিতীয়ত দুর্নীতি দমন কমিশনে আমার মেয়াদকালকে আমি সফল বলে গ্রহণ করবো যদি আমি বাংলাদেশকে দুর্নীতির দিক থেকে সার্ক দেশসমূহের মধ্যে সব চাইতে কম দুর্নীতির তিনটি দেশের মধ্যে একটি দেশ হতে পারি। যদি সার্কভুক্ত সকল দেশের মধ্যে বাংলাদেশের দুর্নীতি অধিকতর থেকে যায় সেটা হবে আমার চরম ব্যর্থতা।

দুর্নীতির বাজার দর

'বর্তমান' বিভাগের পক্ষ থেকে আমি আরেকটা কাজ করবো। দুর্নীতির বাজার দর সংগ্রহ করবো। দুর্নীতির দৈনন্দিন বাস্তবতার সঙ্গে কমিশনকে সম্পৃক্ত রাখার জন্য। প্রায়ই দুর্নীতির বাজারদরের কথা আমাকে শুনতে হয়। অনেক গরিব মা-বাপকে আক্ষেপ করে বলতে শুনি ঃ স্যার ছেলেটা লেখাপড়ায় খুব ভাল করেছে। কিন্তু একটা ভাল চাকরি যোগাড় করে দিতে পারলাম না। এখন তবুও একটা পিয়নের চাকরি যোগাড় করে দিয়েছি।

'কেন এর চাইতে ভাল চাকরি পেলো না?'

'স্যার ভাল চাকরিতে অনেক টাকা লাগে। আমি গরিব মানুষ অত টাকা কোথা থেকে যোগাড় করবো?'

অর্থাৎ শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচ্য বিষয় নয়। যেকোন চাকরি নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিতে হয়। বেশি টাকায় বড় চাকরি, আরো বেশি টাকায় বেশি বেশি উপরি পাবার চাকরি। কম টাকায় ছোট চাকরি। উপরি যত কম চাকরির বাজারে তার দাম তত কম।

কোন চাকরিতে কত টাকা লাগে এটা প্রায় লোক মুখে শুনি। শোনা কথার উপর ভিত্তি করে আমি একটা ফর্দ বানিয়ে দিলাম। আমি ধরে নিচ্ছি এই দরগুলি ঢালাওভাবে সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। ঘুষের বাজারে দালাল থাকে। অনেক সময় তাদের মাধ্যমে কাজটা সমাধা হয়। কমিশন থেকে অমি প্রকৃত বাজারদর সংগ্রহের একটা পদ্ধতি বের করতাম। আপাতত এই ফর্দটা দিলাম। এটা নমুনা মাত্র। প্রকৃত বাজার দরের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে হলে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের মত পত্রিকার কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে দিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বে ২ লক্ষ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগে ২ থেকে ৩ লক্ষ টাকা।

পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর পদে নিয়োগের জন্য ৫ লক্ষ থেকে ৮ লক্ষ টাকা।

পিয়ন নিয়োগে ১ লক্ষ টাকা।

ঝাড়ুদার/ওয়ার্ডবয় নিয়োগে ৫০ থেকে ৮০ হাজার টাকা।

নার্স নিয়োগে ২ লক্ষ টাকা।

সার্ভেয়ার নিয়োগের ক্ষেত্রে ৮০ হাজার থেকে ২ লক্ষ টাকা।

ব্যাংকের এ.জি.এম, ডি.জি.এম পদে পদোন্নতির জন্য ২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা।

ব্যাংকের জি.এম পদে পদোন্নতির জন্য ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২০ লক্ষ টাকা।

অডিট সুপার থেকে এসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার পদে পদোন্নতির জন্য ৩ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা।

কাস্টমসে সুবিধামত পোস্টিং-এর জন্য ৫ থেকে ১০ লক্ষ টাকা।

ডাক্তারদের পছন্দনীয় স্থানে পোস্টিং-এর জন্য ১ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা।

চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় বদলিপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার বদলি বাতিল করতে ৫ লক্ষ থেকে ৮ লক্ষ টাকা।

নার্স, ওয়ার্ডবয় বদলির ক্ষেত্রে ৮০ হাজার থেকে ২ লক্ষ টাকা।

প্রাথমিক শিক্ষকদের পছন্দমত জায়গায় বদলির জন্য ২০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এম.পি.ও ভুক্ত করতে ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকা।

ইত্যাদি ইত্যদি।

আমি ভুক্তভোগী সমিতি এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতি মাসে দুর্নীতির বাজারদরের তালিকা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করতাম। বোঝার চেষ্টা করতাম কমিশনের কার্যক্রমের সঙ্গে বাজারদরের ওঠানামার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। থাকলে কী ধরনের সম্পর্ক। অন্যান্য আরো কী কী বিষয়ের সঙ্গে বাজারদরের সম্পর্ক আছে।

দুর্নীতি সূচকের বিশেষ বিশেষ রেঞ্জের জন্য বিশেষ বিশেষ নামও দেবো যাতে সহজে সবাই বুঝতে পারে এই সূচকের অর্থ কী। যেমন ঃ একটা রেঞ্জের নাম হবে 'উন্মুক্ত দুর্নীতির প্রতিষ্ঠান', আরেকটা হবে 'নিয়ন্ত্রিত দুর্নীতির প্রতিষ্ঠান', আরেকটা 'প্রায় দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান', সর্বশেষ হবে 'দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান'। এই ধরনের শ্রেণী বিন্যাস হলে ওসব প্রতিষ্ঠানের কোনো আত্মসম্মানবোধ থাকলে তারা চেষ্টা করবে পরবর্তী ভাল ধাপে উঠে আসার জন্য। কারণ তাদের ছেলেমেয়েদের কাছে, পাড়া প্রতিবেশীর কাছে তাদের ব্যাখ্যা করতে হবে কেন তারা দুর্নীতিতে এত উঁচুতে আছে। এখন যেমন বাংলাদেশের মানুষকে সর্বত্র ব্যাখ্যা করে বেড়াতে হয় কেন তারা দুর্নীতিতে পৃথিবীর শীর্ষে।

বছর বছর দুর্নীতি মাপতে না-শিখলে দুর্নীতি কমানো যাবে না। কার কত কমলো, কার কত বাড়লো এটা জানা গেলেই নিজেদের বোধোদয় হবে। বোধোদয় হলে অসাধ্য সাধন করা যায়। দুর্নীতি দমন কমিশন কিছু সরকারি কর্মচারীর কর্মস্থল মাত্র নয়। এই কমিশন হবে দেশের মানুষকে একটা মস্ত বড় অভিশাপ থেকে মুক্তিদানে নেতৃত্ব দানের প্রতিষ্ঠান। কমিশনকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে শিখতে হবে। ফাইল নাড়াচাড়ার প্রতিষ্ঠান দিয়ে দুর্নীতি দমন হবে না। শুধু ফাইল নাড়াচাড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকলে দুর্নীতি বরং আরো বাড়বে।

এবার সংক্ষেপে অন্য দু'টি বিভাগের কথা বলি।

'অপসাংবাদিকতাকে যে দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি হিসেবে গণ্য করে এবং তাকে দমন করাও যে কমিশনের কাজ এটা পরিষ্কার তাদের বুঝিয়ে দিতাম। সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতাম'

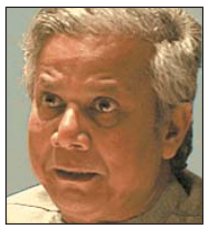

‘ভবিষ্যৎ’ বিভাগ

আমার দ্বিতীয় অগ্রাধিকার থাকতো ‘ভবিষ্যৎ’ বিভাগের উপর। দুর্নীতির গলা টিপে ধরে আগামী পাঁচ বছরে, দশ বছরে কখন নাভিশ্বাস তোলার ব্যবস্থা করবো, কখন তার মৃত্যুঘণ্টা বাজাবো, এটার প্রস্তুতি চলতে থাকবে ‘ভবিষ্যৎ’ বিভাগে। অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতের দিকে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাবার উদ্যোগ চলবে এখানে। দেশের মানুষকে সুশৃংখলভাবে দুর্নীতির মূল উৎপাটনের দিকে নিয়ে যাবার ব্যাপারে সহায়তা দেবে এই বিভাগ।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে দুর্নীতি বিষয়ক গবেষণা চালানো, দুর্নীতি বিষয়ক অ্যাকশান রিসার্চ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করবো। দুর্নীতি বিষয়ে আন্তর্জাতিক গবেষণা এবং অ্যাডভোকেসি প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করবো। বিভিন্ন দেশে দুর্নীতি নির্মূল করার ব্যাপারে কারা কী কী করছে, কিসে ভালো ফল পাচ্ছে, কীভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এগুলি কমিশনে সংগ্রহ করবো। প্রযুক্তি নির্ভর দুর্নীতি মোকাবেলার জন্য কমিশনে এবং কমিশনের বাইরে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার প্রস্তুতি নেবো। আগামী দিনে ব্যাপকভাবে প্রয়োগের জন্য তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক সকল প্রকার জ্ঞান অন্বেষণ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা ক্রমাগতভাবে চালিয়ে যেতে থাকবো “ভবিষ্যৎ” বিভাগের মাধ্যমে।

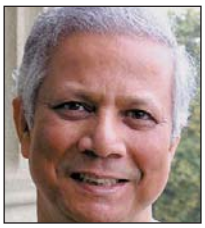

কমিশনের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য স্থির করবো এবং ক্রমাগত মনিটর করে দেখতে থাকবো আমরা লক্ষ্যে পৌঁছার পথ ধরে এগুতে পারছি, নাকি সে পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছি। দুর্নীতির পরিমাণের দিক থেকে আমরা কোনো বছর মালয়েশিয়ার সমকক্ষ হবো, কোনো বছর সিঙ্গাপুরের সমকক্ষ হবো সেটার দিন তারিখ আমরা এখনই স্থির করে নেবো এবং মানুষ যাতে এই দিন-তারিখে আস্থা রেখে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় সেটা নিশ্চিত করবো।

‘অতীত’ বিভাগ

অতীত বিভাগের জন্য আমি কমিশনের সীমিত সময় ও সামর্থ্য ব্যয় করবো। কারণ অতীতের বিশাল দুর্নীতির অতল গহ্বরে যদি আমি একবার ঢুকে পড়ি তাহলে পুরো কমিশনই এর মধ্যে তলিয়ে যাবে। আর এই অবসরে কমিশনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে হেসে খেলে সম্প্রসারিত এবং গভীরতর হতে থাকবে আজকের দৈনন্দিন দুর্নীতি। অতীত নিয়ে অতি ব্যস্ততার কারণে ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করার কাজে হাত দেয়াই হয়ে উঠবে না কমিশনের।

আমি অতীতের দুর্নীতিকে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের কাজে লাগাবো। কিছু দৃষ্টান্তমূলক দুর্নীতিকে বাছাই করে শক্তভাবে হাতে তুলে নেবো, কমিশনের হাত পাকানোর জন্য, কমিশনের সাফল্যের ইতিহাস সৃষ্টি করার জন্য, বর্তমান দুর্নীতিবাজদের সাবধান করার জন্য, আইন প্রয়োগের ব্যাপারে জাতিকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলার জন্য। যেসব কেস বিচারের পথে নিয়ে যাবো সেগুলি নিয়ে প্রধানত আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে অগ্রসর হবার চেষ্টা করবো। কিছু আইন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কমিশনের সম্পর্ক গড়ে তুলবো যাতে তারা আইনি লড়াইয়ের কাজে কমিশনকে সর্বোত্তম সহায়তা দিতে পারে। প্রয়োজন হলে এব্যাপারে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্য সহায়তা নেবো।

দুর্নীতির জন্ম হয় নীতির পেটে

দুর্নীতির জন্ম হয় নীতির পেটে। আইনের বজ্রআঁটুনি ফস্কা গেরোতে। নিয়ম-নীতি এমনভাবে বানানো হয় যাতে নাগরিকদের ভাগ্য একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে। ওপরওলা দেখেও না-দেখার ভান করে। অথবা নিচের-ওলার কাজে তিনি থাকেন খুবই সন্তুষ্ট।

দুর্নীতি কমাতে হলে আইন ও নিয়ম-নীতিতেও ঢুকতে হবে। সেগুলি ঝেড়েমুছে নতুনভাবে তৈরি করতে হবে। এব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অনবরত বৈঠক করে এগুলির সংস্কার চালিয়ে যেতাম। একজন আমলা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে টাকা আদায় করার চেষ্টা করলে যাতে যেকোনো নাগরিক আইন অনুসারে বিকল্প পথে অগ্রসর হতে পারে তার জন্য আইনে ব্যবস্থা রাখতে হবে। অফিসার অর্ডার স্বাক্ষর করবে না টাকা না-দিলে, টাইপিস্ট চিঠি টাইপ করবে না টাকা না-দিলে, ডেসপাচার ডেচপাস নম্বর দেবে না টাকা না-দিলে, পিয়ন ফাইল নিয়ে যাবে না টাকা না-দিলে, রায়ের সার্টিফাইড কপি পাওয়া যাবে না টাকা না-দিলে। পুরো সিস্টেমই এখন অচল। একে সচল রাখতে হচ্ছে টাকা ঢেলে ঢেলে। প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সরকার মসৃণভাবে প্রাইভেটাইজড হয়ে বসে আছে। সরকারি কর্মচারীরা আর সরকারি কর্মচারী নয়। তারা এখন ব্যবসায়ী। তারা ক্ষমতা কেনাবেচার ব্যবসাতে নিয়োজিত। টাকা দিয়ে ক্ষমতা কিনছেন, টাকা দিয়ে পদোন্নতি কিনছেন, টাকা দিয়ে পোস্টিং কিনছেন, টাকার বিনিময়ে সে ক্ষমতা বিক্রি করছেন। আইনকানুন রীতিনীতি হলো তাঁর ব্যবসার উপকরণ। এগুলো জনগণের কল্যাণে সৃষ্টি হলেও তিনি এগুলোকে ঘুরিয়ে নিয়ে এখন জনগণের অকল্যাণে এবং নিজের কল্যাণে নিয়োজিত করছেন। এই বেদখল করা আইনগুলোকে আবার জনগণের দখলে আনার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব হলো দুর্নীতি দমন কমিশনের।

সরকার নিষ্পাপ শিশুর মত কথা বলে

এই দখলে আনার পেছনে প্রচণ্ড চেষ্টার সৃষ্টি না-হলে সরকার একইভাবে চলতে থাকবে। আইনের কথা, নীতির কথা মুখে আওড়াতে থাকবে, আর রাজ্যের উল্টা কাজ সরকার করে যেতে থাকবে আরো দুর্বার গতিতে। সাধারণ মানুষ যেটা স্পষ্টভাবে দেখে, সারাক্ষণ দেখে, জীবন্ত ভাবে দেখে, সরকারের লোকজন দেখতে পায় না কেন? এই রহস্যের কোনো কিনারা পাই না। সরকারের উপর কী অভিশাপ দেয়া আছে যে সরকারে গেলে চোখের জ্যোতি কমে যায়? সরকারকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে সরকার নিষ্পাপ শিশুর মত কথা বলে, তাই নাকি? এরকমটি হতেই পারে না। এটা আপনাদের দেখার ভুল। এটা কারো অপপ্রচার হবে নিশ্চয়ই।

‘বর্তমান’ বিভাগের পক্ষ থেকে আমি আরেকটা কাজ করবো। দুর্নীতির বাজার দর সংগ্রহ করবো। দুর্নীতির দৈনন্দিন বাস্তবতার সঙ্গে কমিশনকে সম্পৃক্ত রাখার জন্য। প্রায়ই দুর্নীতির বাজারদরের কথা আমাকে শুনতে হয়’

আমি যতই ভাবি ততই অবাক হয়ে যাই কত সোজা দুর্নীতি দমনের কাজটা। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে এটা গতকাল পর্যন্ত যতটুকু শক্ত কাজ ছিল আজ তা-ও আর নেই। আগামীকাল আরো সহজ হয়ে যাবে। ই-গভর্নান্স সরকারের সকল পর্যায়ের ব্যবস্থাপনাকে উজ্জ্বল আলোর নিচে সবার চোখের সামনে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে দিতে পারে। কোনো তথ্য, কোনো খবর আর চেপে রাখার সুযোগ নেই। যদি আমরা সুযোগ দিতে না-চাই। ইচ্ছাটাই এখন বড় কথা। আমাদের সকলের মধ্যে ইচ্ছাটা অবশ্যই আছে, কিন্তু সেটা সক্রিয় করার বোতামটা টেপার ব্যবস্থা ছিল না। দুর্নীতি দমন কমিশন সেই বোতামটা হাতের কাছে এনে দিল। এবার বোতাম টিপে ইচ্ছাটা সক্রিয় করার পালা।

আমি আমার মত করে বোতাম টেপার বিষয়গুলি দেখেছি। অন্যরা হয়তো অন্যভাবে দেখবেন। তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং কর্মভঙ্গির প্রেক্ষিত থেকে। কিন্তু লক্ষ্য যে আমাদের সকলের এক সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কাজ যত সহজই হোক, কাজের উদ্যোগ তো নিতেই হবে। হেঁটে খেজুর গাছের তলায় যাই, অথবা চ্যাংদোলা করে কেউ নিয়ে যাক, খেজুর তলায় যেতেই হবে। মুখ হা করতেই হবে। অথবা গাছে চড়ে খেজুর পেড়ে খেতে হবে। কোনোটাই না-করলে খেজুর খাওয়া আমাদের কপালে জুটবে না। মনে যত ব্যাকুলতাই থাকুক।

দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক আয়োজিত মে ২৯, ২০০৫ তারিখ বি.আই.এ.এম. অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থাপিত